হিন্দু পূজার তাৎপর্য হলো অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের সাধন

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা এবং অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা। বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ মঠের গুরু মহারাজ

কেউ কেউ বলেন, আমরা যে পূজা করি তার উদ্দেশ্য আরাধ্য দেবতা বা দেবীকে প্রসন্ন করে পার্থিব জগতে সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয় লাভ করা। তাঁরা আরো বলেন, পূজা যেন দোকানদারি : আমি তোমাকে দিচ্ছি, বিনিময়ে তুমি আমাকে দাও। পূজা যেন এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। এমনকি একথাও বলতে শোনা যায় যে, পূজা আর কিছুই নয়-দেবতাকে উৎকোচ প্রদান। পূজা-উপচারে দেবতা খুশি হবেন, তখন তাঁর কাছ থেকে অভীষ্ট বস্তুলাভ হবে-মামলায় জয়লাভ হবে, পুত্র-কন্যার পরীক্ষায় সাফল্যলাভ হবে, বেকার থাকলে চাকরি হবে, ব্যাধিগ্রস্ত প্রিয়জন ব্যধিমুক্ত হবে, মুমূর্ষু প্রিয়জন মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে, দেবতার উদ্দেশে আমরা যে স্তবগান করি, যে প্রার্থনা উচ্চারণ করি তা তো শুধু 'দেহি' 'দেহি'রই দীর্ঘ তালিকা :

"ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।।"(চন্ডী)

-হে দেবী আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী অর্থাৎ আমার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী সুন্দরী ভার্যা দাও। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার প্রতি যারা বিদ্বেষপূর্ণ অর্থাৎ যারা আমার শত্রু তাদের নাশ কর।

সাধারণভাবে এখন পূজার তাৎপর্য প্রায় এটাই দাঁড়িয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে দেবতার উদ্দেশে স্তব-স্তোত্রাদি বাচ্যার্থে এটাই বোঝায়। কিন্তু পূজার প্রকৃত তাৎপর্যের সঙ্গে স্তব-স্তোত্রাদির প্রকৃত মর্মার্থ জ্ঞাত হলে বোঝা যায় এরকম ধারণা কত ভ্রান্ত। বস্তুত, পূজার তাৎপর্যে কোথাও পার্থিব প্রাপ্তির ব্যাপার নেই। পূজার সমস্ত অঙ্গ, আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি ও মর্ম জুড়ে শুধু একটিই ভাব রয়েছে। সেই ভাব একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক। পূজার সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। ভূমির মানুষ কিভাবে ভূমাকে স্পর্শ করতে পারে, ধরণীর ধূলিমলিন মানব কিভাবে স্বর্গের দেবতায় রূপান্তরিত হতে পারে, পূজার মধ্যে রয়েছে সেই পরম আকুতি। পূজা সান্ত মানুষকে অনন্তে উত্তরণ করাবার একটি পদ্ধতি। পূজার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের প্রাজ্ঞ পূর্বপুরুষগণ অনন্তে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্খাকে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই প্রয়াসের পিছনে ছিল তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সম্পদ। পূজার মুদ্রা, অনুষ্ঠানাদি ও দর্শনের মধ্যে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে বিধৃত করে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষও যাতে উত্তরণের এই 'বিজ্ঞান'-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য তাঁরা পূজার অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি আপাত ও লোকপ্রিয় রূপ সংযুক্ত করেছিলেন। সাধারণ মানুষ প্রথমেই উচ্চ দর্শনকে গ্রহণ করতে পারে না, তাদের সেই মানসিক প্রস্তুতিও থাকে না। পূজার মধ্যে সন্নিবিষ্ট 'শুদ্ধি', 'ন্যাস' প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদির যে একটি লোকপ্রিয় আবেদন আছে তা অনস্বীকার্য। আবার পূজার সঙ্গে যুক্ত স্তব-স্তোত্রাদির মধ্যে যে পার্থিব প্রাপ্তির অঙ্গীকার রয়েছে তা সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে-"এহ বাহ্য" এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদি এবং প্রার্থনার দুটি তাৎপর্য রয়েছে-একটি বাচ্যার্থ, অপরটি লক্ষ্যার্থ। 'রূপং দেহি' ইত্যাদিতে 'রূপ' প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দের একটি আপাত অর্থ আছে, আবার একটি মর্মার্থ বা নিগূঢ় অর্থও রয়েছে। যত 'রূপ' মানে যেমন বাহ্য সৌন্দর্য, তেমনি অন্তরের সৌন্দর্যও। 'জয়' মানে যেমন জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ, তেমনি অন্তরের সংগ্রামেও অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মানস সংগ্রামেও জয়লাভ। 'ভার্যা' মানে যেমন স্ত্রী, তেমনি

আবার যা ভরণীয়–অন্তরে একান্ত লালনীয় অর্থাৎ ভক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অব্যভিচারিণী অনুরক্তি। 'শুদ্ধি' ও 'ন্যাস' প্রভৃতি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কেও একই কথা। 'শুদ্ধি'র অর্থ শুদ্ধিকরণ এবং 'ন্যাস'–এর অর্থ স্থাপন বা সমর্পণ। প্রথমে 'শুদ্ধি', তারপর 'ন্যাস'। প্রথমে আচমনাদির দ্বারা পূজকের 'দেহশুদ্ধি' করতে হয়। পূজক প্রথমে নানা অশুদ্ধ উপাদান ও পদার্থে নির্মিত ও পূর্ণ তাঁর দেহভাণ্ডটিকে মন্ত্রপূত জল দ্বারা শুদ্ধ করেন। 'দেহশুদ্ধি'র সময় তিনি ভাবেন, তাঁর দেহ সমস্ত মালিন্যরহিত হয়ে উঠছে, তাঁর মন অশুদ্ধ চিন্তারাশি থেকে মুক্ত হয়ে উঠছে এবং তাঁর আত্মা দেবময় হয়ে যাচ্ছে। এভাবে 'বাহ্য–অভ্যন্তর' বা দেহ–মন–আত্মার শুদ্ধিকরণের পর 'জলশুদ্ধি'। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী–এই সপ্তনদী হিন্দু ঐতিহ্যে পবিত্রতম নদী বলে প্রসিদ্ধ। নদীমাতৃক ভারতবর্ষে এই নদীগুলি শুধু পবিত্র নদীই নয়, এরা দেবী হিসাবেও বন্দিতা আবার জননী রূপেও পূজিতা। 'জলশুদ্ধি'র সময় পূজক যে অপূর্ব মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন উদাহরণস্বরূপ এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে :

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।"

–হে নদীতমা, দেবীতমা, অম্বিতমা গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরি, সরস্বতি, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরি তোমরা এই জলপাত্রে (জলপূর্ণ কোশাকুশিতে) অধিষ্ঠান কর।

এই আহ্বানের দ্বারা পূজার জলপূর্ণ পাত্রটি যেন পবিত্রতম সপ্তনদীর ক্ষুদ্র সঙ্গমে পরিণত হয়। এরপর সেই পবিত্র জল পূজার সমস্ত উপকরণে ও উপচারে সিঞ্চন করে তাদের পরিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়।

জলশুদ্ধির মন্ত্রটি আরেক দিক দিয়েও লক্ষণীয়। এই মন্ত্রটির মধ্যে রয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের জাতীয় সংহতির উদার উপলব্ধি। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই সাতটি নদী প্রবাহিত। সাংস্কৃতিক প্রেরণা ও ভাবের দিক থেকে সহস্র সহস্র বছর ধরে এই সপ্তনদী হিন্দু ভারতবর্ষকে এক অপূর্ব ঐক্যের প্রেরণার মন্ত্রে সংবদ্ধ করে রেখেছে। বস্তুত, সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রেরণাই ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধকে সঞ্জীবিত করে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শুধু যে পূজার অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নিজ দেহকে দেবময় করতে চেয়েছিলেন তা নয়, আমাদের মাতৃভূমির ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দেহকেও তাঁরা দেবময় বলে ভেবেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে ভারতবর্ষ শুধু মাতৃভূমিই ছিল না, ভারতবর্ষকে তাঁরা দেখেছেন পুণ্যভূমিরূপে, দেবাত্মভূমিরূপে। এভাবে ভারতবর্ষ তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসাবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পূজাকালে পূজকও ভাবেন তাঁর আধিভৌতিক দেহটি ক্রমে দেবময় হয়ে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা প্রাপ্ত হয়েছে।

'জলশুদ্ধি'র পর চতুষ্পার্শ্বের পরিমণ্ডলকে শুদ্ধ করার বিধি। সে–কারণেই 'আসনশুদ্ধি'র বিধান। যে–আসনে বসে পূজক পূজা করেন সেই আসনটিকে শুদ্ধ করার জন্য পূজক ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বসুন্ধরার কাছে প্রার্থনা করেন :

"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।।"

—হে পৃথিবি, তুমি লোকসমূহকে ধারণ করেছ। তুমি বিষ্ণুর দ্বারা ধৃতা। তুমি আমার আসনকে পবিত্র কর। পৃথিবী স্থৈর্য ও ধৈর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর আশীর্বাদে পূজকের স্থৈর্য ও ধৈর্য সুদৃঢ় হবে, তিনি সঙ্কল্পের দৃঢ়তাও লাভ করবেন। মনে কোন চাঞ্চল্য এলে একাগ্রতা অসম্ভব। সেই কারণে স্থৈর্য, ধৈর্য ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা একান্ত আবশ্যক। সে–কারণেই ঐ প্রার্থনা।

পূজার অন্য অনুষ্ঠানাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ন্যাস'। জীবন্যাস, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে পূজকের দেহের প্রতিটি অঙ্গে পঞ্চাশৎ বর্ণের মাধ্যমে পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী মাতৃশক্তিকে 'ন্যাস' অর্থাৎ স্থাপন করা হয়। বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণ আদ্যাশক্তির মন্ত্রময় অঙ্গ। এই ন্যাসের অপর উদ্দেশ্য হলো পূজক তাঁর ভৌতিক দেহের প্রতিটি অঙ্গকে ইষ্টসত্তায় 'ন্যাস' অর্থাৎ সমর্পণ করবেন। এর তাৎপর্য হলো, পূজক যেন তাঁর ভৌতিক দেহকে ত্যাগ করে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হলেন। বস্তুত, পূজার সকল অনুষ্ঠান ও অঙ্গাদির এই একতম উদ্দেশ্য–বহির্মুখী সত্তাকে ক্রমে অন্তর্মুখী করে নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্য–সত্তার জাগরণ ঘটানো এবং অবশেষে চৈতন্য–সত্তায় উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

প্রকৃতপক্ষে পূজা সেই পরম জাগরণেরই একটি প্রক্রিয়া। পূজাদর্শন সেই পরম প্রতিষ্ঠার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। পূজার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো নিজের 'কাঁচা আমি'কে বিসর্জন দিয়ে 'পাকা আমি'তে উত্তীর্ণ হওয়া। 'পাকা আমি'তে উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ–পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তরণ। মানুষের যখন পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটে তখনি তার জীবনের চরিতার্থতা লাভ হয়। এই অবস্থারই অপর নাম দেবত্বে উত্তরণ। পূজায় রয়েছে মরমানুষের দেবময় হয়ে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। পূজার মূলকথাই হলো দেবতা হয়ে দেবতার আরাধনা করা–"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"। পূজার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান ও স্তরের মধ্যে রয়েছে সেই সাধনার কথা, সেই উত্তরণের আহ্বান, সেই প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। পূজার প্রত্যেক অনুষ্ঠান পূজককে দেবময় করে তোলার সেই তাৎপর্যই বহন করে। বিগ্রহের 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র পূর্বে পূজক নিজেকে শুদ্ধ করে নিজের চৈতন্য–সত্তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যপর তিনি বিক্রহের 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করেন। কারণ, স্বয়ং দেবময় হয়ে তবেই দেবতার আরাধনার বিধি। তখন পূজ্য ও পূজক উভয়ের মধ্যে আর কোন ভেদ থাকে না। এর তাৎপর্য হলো : আমি তখন আমারই পূজা করছি। পূজার মূল উদ্দেশ্য তা–ই--- অদ্বৈতের উপলব্ধি।

মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম। দেবত্বই তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ। কিন্তু সেই স্বরূপকে প্রকাশ করতে হবে। সেই প্রকাশের জন্য প্রয়োজন সাধনা, প্রয়োজন সংগ্রাম। পূজার মধ্যে নিহিত রয়েছে সেই সাধনা, সেই সংগ্রামের তাৎপর্য। কিসের সাধনা, কিসের সংগ্রাম? সাধনা পূর্ণতার জন্য, সংগ্রাম নিজের মালিন্যের আবরণকে অপসারণ করার জন্য, যে–মালিন্য আমার যথার্থ সত্তাকে, আমার প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করে রেখেছে। সাধনা ও সংগ্রাম সেই অজ্ঞানকে নাশ করার এবং অবশেষে আমার ও আমার অন্তর্নিহিত ঈশ্বর–উভয়ের মধ্যে অভিন্নতাকে আবিষ্করা করার। অতএব পূজা নিছক অনুষ্ঠান নয়, পূজা একটি বিজ্ঞান। ভৌতিক মানবদেহ কিভাবে চিন্ময় দেবদেহ প্রাপ্ত হতে পারে পূজা হলো তার বিজ্ঞান। 'পূজা–বিজ্ঞান'–এর মর্মকথাটি স্বামী সারদানন্দ সংক্ষেপে অথচ অনবদ্যভাবে 'লীলাপ্রসঙ্গ'–এ বলেছেন : "তুমি কোন দেবতার পূজা করিতে বসিলে অগ্রেই কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তকস্থ সহস্রারে উঠাইয়া ঈশ্বরের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চিন্তা তোমায় করিতে হইবে পরে পুনরায় তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া জীবভাব ধারণ করিলে এবং ঈশ্বর–জ্যোতি ঘনীভূত হইয়া তোমার পূজ্য দেবতারূপে প্রকাশিত হইলেন এবং তুমি তাঁহাকে তোমার ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া পূজা করিতে বসিলে–ইহাই চিন্তা করিতে হইবে।" (২য় ভাগ, ১৩৫৮, গুরুভাব : উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৬)

ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম কখনো 'জড়' বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম জগতে সমস্ত কিছুর মধ্যেই চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছে। 'জড়' বলে যাকে অন্যেরা অভিহিত করে, সনাতন ধর্মের মতে তা চৈতন্যেরই প্রকাশভেদ মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানও আজ একথা বলছে। একইভাবে ভারতের সনাতন ধর্ম কখনো কোন জীবকেই 'জীব' বলে দেখেনি। জীব আসলে ব্রহ্মই, অজ্ঞানবশত জীব জানে না যে, সে ব্রহ্ম। "জীব শিব"–এই অদ্ভুত সমীকরণ পৃথিবীকে

ভারতবর্ষই প্রথম উপহার দিয়েছে। বর্তমানে ধর্ম যেমন নানা মহলে সমালোচিত এবং নিন্দিত, তেমনি পূজাদির ন্যায় অনুষ্ঠানাদিও তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত মহলে উপহাসিত। সমালোচনা ও উপহাস যথার্থ হলে কথা ছিল না, কিন্তু আজ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার নামে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের সমস্তকিছুকেই একদল মানুষ নির্বোধের মতো, তোতাপাখির শেখানো বুলির মতো সমালোচনা, অবজ্ঞা ও উপহাস করে থাকে। এরা আমাদের ঐতিহ্যের মূল্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত না হয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে, আমাদের ধর্মকে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করে। সত্য বটে কালের গতিতে আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের ধর্মে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদিতে নানা বিকৃতি এসে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তাই বলে আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ধর্ম, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেনি। প্রয়োজন অন্তর্দৃষ্টির, প্রয়োজন মুক্ত মন, উদার বোধ ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির, যাতে আমরা বুঝব আমাদের পূর্বপুরুষেরা কত বড় বিজ্ঞানদৃষ্টির, কত গভীর প্রজ্ঞা ও লোকদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। বস্তুত, আজ তাঁদেরই সৃষ্ট ভিত্তিভূমিতেই নিহিত ভারতবর্ষ নামক দেশটির মূল প্রাণরস। সেই আদি প্রাণরস থেকেই উদ্ভূত ভারতবর্ষের সকল গৌরব, সকল মহিমা। ভারতবর্ষ যে স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে তার অধিবাসীদের চেতনাকে অগ্রসর করাতে চেয়েছে, জড়ের শক্তিকে অস্বীকার করে চৈতন্যের শক্তিকে আবিষ্কার করতে সর্বতোভাবে প্রণোদিত করেছে, ভূলোকের ধূলিকে ঝেড়ে ফেলে দ্যুলোকের সৌরভকে অঙ্গে মাখতে অনুপ্রাণিত করেছে–পূজাবিজ্ঞানের কিছু অনুষ্ঠানের আলোচনার মাধ্যমে তা আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়ের পরিসমাপ্তি একত্বের আবিষ্কারে, একত্বের উপলব্ধিতে। পূজার মতো একটি লোকপ্রিয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দুর ধর্ম সেই একত্বকে, সেই অদ্বৈতকেই আবিষ্কার করতে, উপলব্ধি করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পূজা–বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটি আমাদের সকলেরই জানা একান্ত প্রয়োজন।